ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ইংরেজি ভাষা

*সুভাষ চন্দ্র সরকার

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের সংবিধান 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ঘোষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা নির্দেশ করলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনে ইংরেজি ভাষার মর্যাদা বা অবস্থান কী প্রকৃতির হবে, সেই সম্পর্কে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেনি। ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় নীতিনির্ধারণীতে বাংলাকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাভাষী অঞ্চলে প্রায় সাড়ে তিনশত বছর ধরে ইংরেজির অবস্থান ও বিচরণ এবং দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসনের ফলে এটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই গবেষণা প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ভাষানীতিতে ইংরেজি ভাষার মর্যাদা ও অবস্থান অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা। বর্ণনামূলক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান, সরকারের গৃহীত নীতি, নির্দেশ, আদেশ ও প্রচলন এবং সহায়ক উপকরণ হিসেবে ভাষা-রাজনীতি, ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক রচনাবলি ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী ভাষাভিত্তিক নীতি ও নির্দেশনায় ইংরেজি ভাষা নিয়ে চলমান অস্পষ্টতা ও দিকনির্দেশনার অভাব তুলে ধরা হয়েছে।

১. ভূমিকা

ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশে কোনো লিখিত স্বতন্ত্র ভাষানীতি না থাকলেও বাংলাদেশের সংবিধান, সরকারের গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত, সরকারি বিধি, বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারি নির্দেশ, আদেশ ও প্রচলনে বাংলাদেশের ভাষানীতির প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধান 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ঘোষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা নির্ধারণ করেছে এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রত্যাশায় বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান ইংরেজি ভাষার মর্যাদা বা অবস্থানটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনে কী প্রকৃতির হবে, সেই সম্পর্কে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করেনি; ফলে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সামগ্রিক ভাষা পরিস্থিতিতে ইংরেজি অঘোষিতভাবে কখনো বিদেশি ভাষা কিংবা কখনো দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় নীতিনির্ধারণীতে বাংলাকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতা ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রশাসন, শিক্ষা, আইন ও গণমাধ্যমে ইংরেজি ভাষা প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে।[১] এই ভাষিক অবস্থা কোনো আইনি নির্দেশে সৃষ্টি হয়নি, বরং এটি প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ধরে বাংলাভাষী অঞ্চলে ইংরেজির অবস্থান ও বিচরণের ফলে চলে আসা প্রথার ভাষা-পরিস্থিতিজনিত পরিণতি।[২] মূলত বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার মর্যাদা বা অবস্থান তথা ইংরেজি ভাষা-পরিস্থিতি কেমন আছে ও হবে, তা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় নীতি, মাতৃভাষাকেন্দ্রিক ভাষিক দর্শন ও ব্যক্তিক ভাষা-ব্যবহারের মিথস্ক্রিয়ার উপর। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নীতি, নির্দেশ, আদেশ ও প্রচলনের আধেয়

* এমফিল গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত মনোভঙ্গিকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশের ভাষানীতিতে ইংরেজির মর্যাদা ও অবস্থান অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

২. ভাষানীতি ও বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মানুষ ও মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাথে ভাষার ইতিহাস সম্পূরকভাবে জড়িত। মানুষ তার চিন্তাভাবনাকে ভাষার মাধ্যমে ধরে রাখবার কৌশল আবিষ্কার করেছে এবং প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে ভাষাবিষয়ক বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, ওই উপাত্তের আভ্যন্তর শৃঙ্খলা উদ্‌ঘাটন এবং ওই শৃঙ্খলা সুস্পষ্ট সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করে আসছে।[৩] ভাষা তার নিজের নিয়মে বদলায় এবং যারা ভাষার ব্যবহারকারী তারাও ভাষার অবয়ব ও মর্যাদায় পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ভাষা ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় ভাষার সচেতন পরিবর্তনে গৃহীত নীতি বা সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভাষানীতি এবং এই ভাষা-পরিবর্তনে সরকার বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত, প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি অবদান রাখতে পারেন। কোনো দেশের রাষ্ট্রভাষা বা দাপ্তরিক ভাষা বা জাতীয় ভাষা কী হবে, শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে, কোনো দ্বিতীয় ভাষা থাকবে কি না, ধ্রুপদি ভাষা বা কোনো বিদেশি ভাষা পঠিত হবে কি না, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষা গুরুত্ব পাবে কি না ইত্যাদি মৌলিক নীতি হচ্ছে ভাষানীতি । মূলত ভাষা-ভাবনার তাত্ত্বিক পটভূমি হচ্ছে ভাষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভাষা সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের প্রয়াস।

'ভাষানীতি' এবং 'ভাষা-পরিকল্পনা' প্রত্যয় দুটো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হলেও 'ভাষানীতি' প্রত্যয়টি ভাষাবিজ্ঞানে 'ভাষা-পরিকল্পনা' প্রত্যয়ের পরে এসেছে এবং দুটি প্রত্যয়ই প্রধানত ভাষাবিজ্ঞানের সমাজভাষাবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত হয়ে আলোচিত হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানে 'ভাষা-পরিকল্পনা' ধারণাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রবর্তিত হলেও ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত কর্মকাণ্ড বহু প্রাচীন এবং ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক পাণিনি তাঁর সমকালীন যুগের ভাষাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য যেসব ভাষিক কৃৎকৌশল অবলম্বন করেছেন, সেগুলোর বহু কিছুই এখন ভাষা-পরিকল্পনার বিষয় হিসেবে স্বীকার্য।[৪] পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকের কাছাকাছি সময়ে প্রাচীন ভারতে ভাষা সংস্কারের প্রথম উদ্যোগ নেন এবং 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে চার হাজার সূত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। প্রাচীন ভারতে ভাষার শৃঙ্খলা বর্ণনার প্রথাগত ধারায় পাণিনি সংস্কৃত ভাষাকে সুপরিকল্পিতভাবে মান্যায়িত করে, তাকে সমস্যামুক্ত করে, সে ভাষার একটি সুস্থিত রূপ দেন।[৫] খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিকভাষার প্রথম স্বতন্ত্র ব্যাকরণ 'তেক্‌নে গ্রামাতিকে' রচনা করে অমর হয়ে আছেন দিওনুসিওস্ থ্রাক্স এবং প্রথম যে লাতিন ব্যাকরণের নিদর্শন পাওয়া যায় তা হলো খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বৈয়াকরণ ভারো রচিত 'দে লিঙ্গুয়া লাতিনা'।[৬] কিন্তু পাণিনি, থ্রাক্স কিংবা ভারো প্রমুখের ভাষা নিয়ে কাজ ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনার কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেনি। আধুনিক ইতিহাসে রেনেসাঁস আবেগে পরিশ্রুত প্রথম ভাষা-পরিকল্পনা সংস্থা হচ্ছে একাডেমিয়া ডেল্লা ক্রুসকা বা লা ক্রুসকা। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইটালির ফ্লোরেন্সে প্রতিষ্ঠিত ক্রুসকার উদ্দেশ্য ছিল ইটালির জাতীয় ঐক্যসাধনের জন্য জাতীয়-ভাষা ধারণা ব্যবহার করা। ইটালীয় লা ক্রুসকার আদর্শে ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের প্যারিসে একাডেমি ফ্রানসেস্, ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের মাদ্রিদে রিএল একাডেমিয়া এসপানোলা এবং ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুইডেনের স্টকহোমে সভেন্‌সকা একাডেমিয়ান

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভাষা-পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিকে উন্নত ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯০২ সালের ৮ আগস্ট দি ব্রিটিশ একাডেমি এবং ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত *International Communication: A Symposium on the Language Problem* নামক সংকলিত গ্রন্থে ভাষা-সমস্যা, ভাষা-পরিস্থিতি, নির্মিত ভাষা প্রভৃতি ধারণা প্রকাশিত হয় এবং ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড সাপির আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ করা ও একটি আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষার কার্যক্রম নিয়ে আলোকপাত করেন।[৭] এসব চিন্তাভাবনা, কর্মকাণ্ডকে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ব্যবহৃত ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা ধারণার পূর্বসূত্র হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[৮] ভাষা-পরিকল্পনা অভিধাটি ইউরিয়াল ওয়াইনরাইখ সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে প্রবর্তন করলেও এর তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি রচনা করেন আইনার হগেন। আইনার হগেন ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত 'নগরায়ণ ও প্রমিত ভাষা সভায় পঠিত 'Planning for a Standard Language in Modern Norway' শীর্ষক প্রবন্ধে 'ভাষা-পরিকল্পনা' পরিভাষা ব্যবহার করেন ও পরিভাষাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মূলত ভাষা-সমস্যা হতে ভাষার অবয়ব সংস্কার, মর্যাদা নির্ধারণ ও পরিবর্তনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেষণা থেকে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ।

ভাষানীতি হলো ভাষিক আদর্শিক অবস্থা এবং ভাষা বিষয়ক আইন ও প্রচলন। ভাষাবিজ্ঞানী ম্যারি ম্যাকগোর্য়াটি তাঁর "Language Policy in the USA" প্রবন্ধে ভাষানীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'the combination of official decisions and prevailing public practices related to language education and use'.[৯] উপনিবেশ-উত্তর ভাষা-আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের এই যুগে সুনির্দিষ্ট ভাষানীতির অভাবে ভাষা-পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠতে পারে না। ফলে উন্নত বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ভাষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা শুধু তাদের ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই নয় বরং তা শিক্ষাসহ জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ ভাষানীতি নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী রিচার্ড নস (১৯৭১) তিন ধরনের নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা:

ক) সরকারি ভাষানীতি: কোনো দেশের সরকার কোন ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা বা জাতীয় ভাষা কিংবা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করে।

খ) শিক্ষা ভাষানীতি: কোনো দেশের সরকার শিক্ষার কোন স্তরে কোন ভাষাকে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা, বিদেশি ভাষা, ধ্রুপদি ভাষা, গোষ্ঠীভাষা প্রভৃতি হিসেবে ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করে।

গ) সাধারণ ভাষানীতি: কোনো দেশের সরকার কোন ভাষাকে সাধারণের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশে ভাষাচর্চা, ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনার ইতিহাস খুব বেশি পুরানো নয়। বাংলা ভাষাতত্ত্বের সূচনা ঘটে বাংলা ভাষার উন্মেষের আটশো বছর পরে আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে একজন বিদেশি-পর্তুগিজ-ধর্মযাজকের হাত ধরে এবং পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁও রচনা করেন বাংলা ভাষার প্রথম শব্দকোষ ও খণ্ডিত ব্যাকরণ *ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা, ই পোর্তুগিজ: দিভিদিদো এম দুয়াস পার্তেস*। কিন্তু আসসুম্পসাঁও এই কাজ করতে গিয়ে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার গঠন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে বাংলা ভাষা

সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করা হয়।[১০] তারপর নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড, উইলিয়াম কেরি, রামমোহন রায়, জন বিমস্, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জর্জ গ্রিয়ারসন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আরো অনেকে বাংলা ভাষার আন্তর-বাহ্যিক সূত্র বিশ্লেষণ করে বাংলা ভাষাতত্ত্বের ধারাকে বিকশিত করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত গ্রন্থ *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত* এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত গবেষণা গ্রন্থ *The Origin and Development of the Bengali Language* (ODBL)-এর মাধ্যমে বাঙালির মাতৃভাষা চর্চার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তী ভাষাচর্চার সৌধ ও বাংলা ভাষানীতির আলোচনা-সমালোচনা ও গবেষণা।

বাংলা ভাষানীতি ও ভাষাপরিকল্পনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অবদান হচ্ছে বাংলা ভাষা ও তার মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর সচেতন ও সমন্বিত ভাবনা। তিনি পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষাচর্চার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আদলে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধি থেকে বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। বাঙালির মাতৃভাষা কী হবে এই নিয়ে বাঙালির সংশয়ে তিনি বিস্মিত হয়েছেন এবং 'বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি যখনই আক্রান্ত হয়েছে, তখনই তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন'।[১১] ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দীন আহমদ হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলে এই সুপারিশের অসারতা প্রসঙ্গে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[১২] তিনি মত প্রকাশ করেন: "বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই।"[১৩] অতঃপর ১৯৪৮ সালে তিনি পাক্ষিক তকবীর পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা, আরবি, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের নীতি কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করেন। মূলত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে তাঁর ভাষা-ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বাংলা ভাষাচর্চায় আধুনিক ইউরোপীয় ও মার্কিন ভাষাচর্চার ভাবধারা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে মূল তাত্ত্বিকদের একজন মুহম্মদ আবদুল হাই। বাংলা ভাষার মর্যাদা সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মনে কোনো দ্বিধা ছিলো না এবং পূর্ব পাকিস্তানের লেখাপড়ার ভাষা, অফিস-আদালতের ভাষা, যোগাযোগের ভাষা বিকল্পহীনভাবে বাংলা হোক, এটা ছিল তাঁর ভাষাপরিকল্পনার মূল মন্ত্র।[১৪] তিনি ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসের ৭ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত আমেরিকার হাওয়াইতে অনুষ্ঠিত ভাষা-পরিকল্পনা ও ভাষানীতি বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৬৯ সালের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনারে তাঁর পঠিত 'The Development of Bengali since the Establishment of Pakistan' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা ভাষার পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর চিন্তার সারাৎসার প্রতিফলিত হয়েছিলো। ঐ প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান করেছিলেন এবং ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের

সংবিধানে 'বাংলা' এবং 'উর্দু' ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করার কথা বলেছিলেন। এই বাংলা ভাষার বিকাশে বাংলা একাডেমি এবং কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তিনি এই প্রবন্ধে তার বিস্তারিত বিবরণ দেন এই আশায় যে, ১৯৭০ সাল নাগাদ দাপ্তরিক কাজকর্মে বাংলা ভাষা ইংরেজি ভাষাকেও হটিয়ে দিতে পারবে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষা পরিকল্পনা বিষয়ক প্রবন্ধে ইংরেজিকে এভাবে হটিয়ে দেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে তিনি একাডেমিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির গুরুত্বকে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করতেন এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য তাই তিনি ইংরেজি কোর্সের ব্যবস্থা রেখেছিলেন।[১৫] এছাড়া ভাষার সাধু রূপ আর চলিত রূপের মধ্যে চলিত রূপের প্রতি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সমর্থন লক্ষ করা যায় এবং যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একুশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশ চলিত-রীতি ভিত্তিক যে প্রমিত গদ্যভাষা পেয়েছে, সেটাকে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উত্তরাধিকার বললে খুব একটা বেশি বলা হয় না। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর "Language Planning in Bangladesh" প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষা পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

> With the emergence of Bangladesh as a sovereign country, the purpose and meaning of language planning in Bangladesh has changed. Hai's description (1971) of the activities of the Bangla Academy, the Central Board for the Development of Bengali and the Department of Bengali at the University of Dacca in the context of Pakistan is a very useful narration of some gains in the late sixties. But the perspective is now different.[১৬]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উচ্চশিক্ষায় ও ব্যবহারিক জীবনে বাংলাভাষার প্রয়োগ' শিরোনামে ভাষা বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন এবং অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সেমিনার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। সেমিনারে ব্যবহারিক জীবনে ও উচ্চশিক্ষায় বাংলা; ইংরেজি শিক্ষা ও আমরা; বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা; আইন শাস্ত্রের পঠন-পাঠনে বাংলাভাষার প্রয়োগ; ব্যাংক পরিচালনা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার; উচ্চ পর্যায়ে বাংলায় শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয় উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বাংলা ভাষার অবয়ব, শিক্ষায় বাংলা কিংবা ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৯৭৬ সালে সেমিনারে বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের পঠিত প্রবন্ধসমূহ সংকলিত করে মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সম্পাদনায় *উচ্চশিক্ষায় ও ব্যবহারিক জীবনে বাংলাভাষার প্রয়োগ* গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

বাংলা ভাষাচর্চা, ভাষার উন্নতিসাধন ও ভাষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কাজ করে থাকে। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার পর ১৯৯২ সালে পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকে এবং সরকারি বিভিন্ন কাজে বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলা একাডেমি ২০০৯ সালে বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিলো খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করা। কিন্তু বাংলা ভাষা-পরিকল্পনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলা একাডেমি

বাংলা ভাষার অবয়ব ও মর্যাদা উন্নয়ন কিংবা অভিধান ও পরিভাষা প্রণয়নে ভূমিকা রাখলেও বাংলা ভাষার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার মর্যাদা ও অবস্থান বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়। এছাড়া ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিশেষত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ, মাতৃভাষার চর্চা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সুরক্ষা প্রদান করে থাকে । এই সংস্থাটি বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে; কিন্তু বাংলাদেশের ভাষানীতিতে ইংরেজি ভাষার অবস্থান কিংবা মর্যাদার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির কোনো দৃশ্যমান কার্যক্রম নেই।

১৯৯৩ সালের ২৯ ও ৩০শে এপ্রিল বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে সোসাইটির অডিটরিয়ামে "বাঙালীর বাঙলা ভাষা চিন্তা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ ও ভারতের ভাষাবিজ্ঞানীরা সার্ক (SAARC) দেশগুলোর প্রেক্ষাপট মনে রেখে দুটো সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছেন; কিন্তু ইংরেজি ভাষা প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন।

২০১৪ সালের ২১ ও ২২শে নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজে প্রতিষ্ঠানটির চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা' শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে ভাষানীতি প্রণয়ন; উক্ত নীতিমালায় বাংলা ভাষা, আন্তর্জাতিক ভাষা, ধ্রুপদি ভাষা, এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান; একটি ভাষা-কমিশন গঠন; সমন্বিত ভাষা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং ভাষা সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাকে আইনে পরিণত করা এবং তা প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়।[১৭]

৩. বাংলাদেশের ভাষানীতিতে ইংরেজি ভাষা

হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বিশ্লিষ্ট হয়ে বঙ্গীয় ভূখণ্ডে প্রাকৃত বাঙলা ভাষার উদ্ভব ঘটে এবং এই ভাষা সহস্র বছর ধরে অসংখ্য কোটি প্রাকৃত মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তবতাকে বহন ও প্রকাশ করে এক পূর্ণবিকশিত সুস্থিত মানরূপসম্পন্ন বিশ্বভাষায় পরিণত হয়।[১৮] পূর্বকাল থেকেই বঙ্গদেশে দ্বিভাষিকতা ও বহুভাষিকতা বিরাজিত ছিলো এবং এ অঞ্চলের ভাষা বাংলা হলেও সুদূর অতীতে বাংলা কখনো রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়নি। এক সময় সংস্কৃত ছিল রাজভাষা; তারপর ফারসি ছিল রাজভাষা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন এই উপমহাদেশ অধিকার করে, তখন উপমহাদেশ জুড়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা পরিস্থিতি বিরাজিত ছিলো। কিন্তু বাংলা তথা ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) শক্তির অধীনে নিপতিত হলে, ইংরেজি ভাষা বাংলার বহুভাষিকতায় নতুন অনুষঙ্গ যুক্ত করে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলার ভাষা-রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। বাংলা ব্রিটিশ-ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কখনোই গৃহীত হয়নি; বরং উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে প্রজাদের ক্ষমতাবান অংশটি ইংরেজির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার বাংলা তথা ভারতে ১৮৩৫ সালে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম, ১৮৩৭ সালে রাজভাষা এবং ১৮৪৪ সালে চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে ঘোষণা জারি করে। ১৮৩৫ সালে মেকলের 'মিনিটস' ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কিংবা ১৯১১ সালের

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ-এই প্রায় শতবর্ষ কালের মধ্যে বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসার ঘটে।[১৯] উপনিবেশে ইংরেজির উপস্থিতি কেবল একটি ভাষার উপস্থিতি নয়; তা ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বা 'হেজিমনি'র সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনামলে পাল্টে যাওয়া সেই ভাষা-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিণাম এখনও বিদ্যমান রয়েছে। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ভাগের উপপ্রক্রিয়া হিসাবে বাংলা ভাগ হলে, বাংলা ভাষার মর্যাদা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বাংলা ভাষা ভারত ও পাকিস্তানে যথাক্রমে হিন্দি ও উর্দু ভাষার আধিপত্যবাদের কবলে নিপতিত হয়।

পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের উপলব্ধিগত সংকটের কারণে 'এক রাষ্ট্র, এক ভাষা' তত্ত্বের ভ্রান্ত নীতি আরোপ করতে গিয়ে রক্তক্ষয়ী ভাষা-সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পরিণতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হলেও স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ২১৪ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা'। সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও পরবর্তী ২০ বছর প্রশাসন ও অন্যান্য কাজে ইংরেজি চালু রাখার বিধান রাখা হয়।[২০] পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধানে 'রাষ্ট্রভাষা' শব্দটি নির্বাচিত হয়নি, হয়েছিল 'জাতীয় ভাষা' শব্দটি। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালের সংবিধানে উর্দু ও বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বলা হয়, "এই অনুচ্ছেদ ইংরেজির ব্যবহারকে নিরোধ করবে না এবং ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজি পরিত্যাগের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করবেন।"[২১]

বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাত্র কিছুদিন পূর্বে ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির এক সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী ও সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান নিম্নরূপ দৃপ্ত ঘোষণা দিয়েছিলেন:

> ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস-আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করবো না। কারণ তাহলে কোনোদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছুকিছু ভুল হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।[২২]

১৯৭১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা দিয়েছিলেন 'বাংলা হবে দেশের সরকারি ভাষা' এবং "স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রপতিত্বের প্রথম কর্মদিবসেই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সকল নথি বাংলায় লিখিত হতে হবে— এই মর্মে একটি প্রজ্ঞাপন জারির নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[২৩]

বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি স্থানে ভাষা প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদে 'বাংলা' একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে নির্দেশিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে – 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা'। অনুচ্ছেদ ২৩ বাংলাকে 'জাতীয় ভাষা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রকে জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের

জন্য জাতীয় ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বাংলাদেশের সংবিধান ১৫৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে যথাযথ সম্মান দিয়েছে:

> বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ এবং ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পিকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন [অনুচ্ছেদ ১৫৩(২)]।

সংবিধানের ১৫৩ (৩) অনুচ্ছেদে বাংলা ভাষার আধিপত্য দৃঢ়ভাবে সংযোজন করা হয়েছে:

> এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোনো পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে, বাংলা পাঠ্য প্রাধ্যন্য পাইবে [অনুচ্ছেদ ১৫৩(৩)]।

কিন্তু সংবিধান সংশোধনীর ফলে সংযোজিত দ্বিতীয় ঘোষণা (পঞ্চদশ সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৮-এ একটি স্ব-বিরোধিতা রয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় তফসিল বলে সন্নিবেশিত সংযোজনীতে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ এবং তফসিল সংশোধনের ক্ষেত্রে ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাবে যা সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সাংর্ঘষিক। ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রের আদেশ ৪-এর চতুর্থ তফসিলে 'কতিপয় ফরমান বৈধকরণ ইত্যাদি' শিরোনামে সংযোজিত ৯ দফায় বলা হয়েছে:

> সংবিধানের বাংলা বা ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ, বৈপরীত্য, অসংগতি অথবা অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে, যতদূর তাহা উক্ত ফরমানসমূহ দ্বারা সংবিধানের কোনো পাঠ কিংবা উভয় পাঠের কোনো সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন অথবা বিলোপ-সাধন সম্পর্কিত হয়, ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাইবে [অনুচ্ছেদ ১৫০(৩ক)]।

সারণি: ১ বাংলাদেশের সংবিধানে ভাষা প্রসঙ্গ

অধ্যায়	শিরোনাম	অনুচ্ছেদ	বিষয়বস্তু
প্রথম ভাগ	প্রজাতন্ত্র	অনুচ্ছেদ ৩	'রাষ্ট্রভাষা'
দ্বিতীয় ভাগ	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	অনুচ্ছেদ ২৩	'জাতীয় সংস্কৃতি' উপশিরোনামের অধীনে 'জাতীয় ভাষা'
একাদশ ভাগ	বিবিধ	অনুচ্ছেদ ১৫৩	'প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ' উপশিরোনামের অধীনে 'বাংলা এবং ইংরেজি পাঠ'
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী	অনুচ্ছেদ ১৫০(৩ক)-এর ৯ দফা	'কতিপয় ফরমান বৈধকরণ ইত্যাদি' উপশিরোনামের অধীনের ৯ দফায় 'বাংলা এবং ইংরেজি পাঠ'

সাংবিধানিক বিধানাবলি পূর্ণরূপে কার্যকর এবং বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে ১৯৮৭ সালের ৮ মার্চ 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' প্রণয়ন করা হয়। এ আইন পাস ও প্রচলনের পর ১৯৮৭ সাল থেকে বাংলাদেশে নতুন সকল আইন অধ্যাদেশ, বিধি বিধান ও প্রজ্ঞাপন প্রভৃতি বাংলা ভাষায় প্রণীত হচ্ছে। আইনটির ৩ ধারায় বৈদেশিক যোগাযোগের ক্ষেত্র ব্যতীত সকল সরকারি অফিসআদালত ও সভা-সমিতিতে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আইন লঙ্ঘনকে সরকারি কর্মচারীর জন্য অসদাচরণ বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই আইন ভঙ্গের অভিযোগে কারো বিরুদ্ধে শাস্তির কোনো নজির নেই। এই আইন

বাংলাদেশকে একটি একভাষিক দেশে রূপান্তরিত করেছে; কিন্তু প্রত্যাশিত ফলাফল এখনও অসম্পূর্ণ এবং বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

মূলত রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার সাংবিধানিক স্বীকৃতি বাংলাদেশের ভাষানীতিতে পরিবর্তন আনলেও ইংরেজির অবস্থান ও মর্যাদা অসংজ্ঞায়িত থেকে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে গৃহীত ভাষানীতি প্রধানত বাংলার উপর জোর দিয়েছে এবং 'সকল স্তরে বাংলা' নীতি বাংলাদেশে ইংরেজির মর্যাদাকে প্রভাবিত করেছে। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করলেও মর্যাদা নির্ধারণ করেনি। ফলে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে সরকারি নীতি, আদেশ ও নির্দেশনায় অস্পষ্টতা প্রতিফলিত হয়।

৪. বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও ইংরেজি ভাষা

ভাষানীতি একটি দেশের শিক্ষা নীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং তাই কোনো দেশে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি দ্বারা একটি ভাষার মর্যাদা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি থেকে বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ইংরেজি ভাষার মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার কারণে ইংরেজি ভাষার অবনমন ঘটে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষা "ঐতিহাসিক কারণে" নীতিগত স্বীকৃতি সত্ত্বেও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি বিলুপ্ত করা হয়; ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়াা হয় এবং সমস্ত সরকারি চাকরির পরীক্ষা থেকে ইংরেজি বাদ দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বাংলাকরণ নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়; কিন্তু শিক্ষার তৃতীয় স্তরে ইংরেজিকে বাংলার সমান্তরালভাবে চলতে দেওয়া হয়েছিল।

নতুন রাষ্ট্রের বিকাশ ও অগ্রগতির লক্ষ্যে উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের উপলব্ধি থেকে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।[২৪] কুদরত-এ-খুদা কমিশন ব্যাপক জরিপ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষাসংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখা প্রণয়ন ও ভাষা-শিক্ষা নীতি নির্ধারণ করে ১৯৭৪ সালের ৩০ মে সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করে। এই কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'উপনিবেশমুক্ত' করার জন্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের দৃঢ় অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতির রূপকল্পে সংবিধানের চারটি স্তম্ভকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।[২৫] ইংরেজির ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্বীকার করে কুদরত-ই-খুদা রিপোর্টে ইংরেজিকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়নি, কিন্তু ইংরেজির মর্যাদা অবনমন করা হয়। অতঃপর ১৯৭৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিশনকৃত ইংরেজি শেখার টাস্ক ফোর্স ইংরেজির পক্ষে সুস্পষ্ট সুপারিশ করে এবং ৩য় বা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ইংরেজি চালু করার প্রস্তাব দেয়। তারপর ১৯৭৬ সালে জাতীয় পাঠ্যক্রম কমিটি ৩য় শ্রেণি থেকে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল এডুকেশন কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৮ এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম কমিটি, ১৯৯১ ৩য় শ্রেণিতে ইংরেজি প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিল। জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০০০ ইংরেজিকে ১ম এবং ২য় শ্রেণিতে অতিরিক্ত বিষয় এবং ৩য় শ্রেণি থেকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে প্রবর্তনের জন্য জোরালো সুপারিশ করে। জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ২০০৩ প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে জোর দেয় এবং ইংরেজিকে একটি দরকারি বিদেশি ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার সুপারিশ করে।

দেশের সর্বশেষ শিক্ষানীতি, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ একটি শক্তিশালী এবং প্রগতিশীল জ্ঞান-ভিত্তিক এবং তথ্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ইংরেজি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই নীতিতে সুপারিশ করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীদের ব্যবহারযোগ্য দক্ষতা অর্জন ও উচ্চ স্তরে অব্যাহত রাখার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকেই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই নীতিতে আরও সুপারিশ করা হয়েছে যে যেকোনো বিদ্যালয় মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি চালু করার পাশাপাশি সমস্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ইংরেজিকে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে বেছে নিতে পারবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ শিক্ষার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিকে বাংলার সাথে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে সুপারিশ করেছে। কিন্তু সরকার এখনও জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর ভিত্তিতে একটি শিক্ষা আইন প্রণয়ন করতে পারেনি এবং উপযুক্ত ভাষানীতির অভাবে ভাষা-শিক্ষায় অরাজকতা বিরাজ করছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনার উপর ব্যাপক গবেষণা হলেও বাংলাদেশে ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা বিষয় নিয়ে কিংবা বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনায় ইংরেজি ভাষার মর্যাদা ও অবস্থান নিয়ে গবেষণার ব্যাপ্তি ও সংখ্যা প্রত্যাশিত মাত্রার তুলনায় কম। তাছাড়া বাংলায় সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চা খুব বেশি দিনের নয় বলে বাংলা ভাষায় সর্বক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষা এখনো গড়ে ওঠেনি। বাঙালির ভাষাচিন্তা এবং ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা ও সমন্বয়হীনতা বিরাজ করছে ও এই ভারসাম্যহীনতা ও সমন্বয়হীনতা দূর করার কোনো সামগ্রিক উদ্যোগ নেই। ফলে বাংলাদেশে বিরাজিত ভাষাগত আদর্শ, ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনার নিরিখে ইংরেজি ভাষা-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও কার্যকরী কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়নি। বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনার ওপর অতীতকৃত গবেষণায় বাংলা ভাষার অবয়ব উন্নয়ন ও মর্যাদা নির্ধারণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কিংবা বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার সাম্প্রতিক প্রবণতা অথবা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের জাতীয়তাবাদী একভাষিতার নীতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনায় ইংরেজি ভাষার মর্যাদা ও অবস্থান অনুসন্ধান কিংবা ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা ও অপরিহার্যতা নির্ধারণ অথবা বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা অনুসারে ইংরেজি ভাষা-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়নি। তাই বাংলাদেশে বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সহাবস্থানের মাধ্যমে কীভাবে উপযুক্ত ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায় তা গবেষণার দাবি রাখে।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার প্রতি নীতিগত সিদ্ধান্ত ও ইংরেজি ভাষার মর্যাদার ভিত রচনা করে দিয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতির চারটি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র যথা: প্রশাসন, শিক্ষা, আইন ও গণমাধ্যমে ইংরেজি ভাষা নীতি ও অনুশীলনের পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে গেলেও ইংরেজির দাপট কমেনি। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন-যন্ত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সাংবিধানিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক অতীত ও বৈশ্বিক ইংরেজির ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন-যন্ত্রে ইংরেজির ধারাবাহিকতাকে টিকিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজি ভাষার নীতি ও অনুশীলনের পরিবর্তনশীলতার রূপরেখা দ্বারা

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ফলশ্রুতিস্বরূপ সামগ্রিক ইংরেজি শিক্ষার মানের অবনমন ঘটেছে। বাংলা নিম্ন আদালতে ইংরেজিকে প্রতিস্থাপিত করতে পারলেও বাংলাদেশের আইনের ব্রিটিশ উত্তারধিকারের কারণে উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম বাংলা ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করলেও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ ভাষাতাত্ত্বিকভাবে পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘ ইতিহাসযুক্ত ইংরেজি-দ্বিভাষিক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ও সমাজভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইংরেজি ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন ও পরিণতি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ভাষানীতির কারণে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বাস্তবায়ন সীমিত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বাংলাদেশ বাহ্যিক সহায়তা সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষা-পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ সরকারকে পরিস্থিতির জটিলতা স্বীকার করে জাতীয় পর্যায়ে ইংরেজির বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক অনুমিত মূল্য (the perceived value of English in nations' global competitiveness) অনুধাবন করে সমস্যার সমাধানে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (Hamid and Elizabeth J Erling, 2016: 47)।[২৬] এছাড়া বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ছাড়াও বৈশ্বিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষার বাজার রয়েছে এবং সেই সামাজিক স্তরবিশিষ্ট বাজার নির্ধারণ করে দেয় কে বা কারা ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতা অর্জন করে ভাষাতাত্ত্বিক মূলধন হিসাবে ইংরেজি ভাষার বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে।[২৭]

মূলত বাংলাভাষী অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হওয়ায় বাংলাভাষাকে হয়ে উঠতে হয়েছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিপূরক বাহন। ফলে বাংলা ভাষার বিদ্যমান ভাষা-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে; মর্যাদার বদল ঘটেছে এবং উপনিবেশকের ভাষা উপনিবেশিতের ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে দখল করেছে প্রভাবশালী ময়দানগুলো। সাম্রাজ্যবিস্তারের এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ভাষাবিকাশের পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করেছে এবং সাম্রাজ্যশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার সামাজিক প্রক্রিয়া ভাষানির্মাণের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।[২৮] ইংরেজি ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানী হুমায়ুন আজাদ 'সাম্রাজ্যবাদী রাজভাষা' ও মোহাম্মদ আজম 'প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের ভাষা' বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁরা মনে করেন যে, বাঙালির কাছে বাংলা এখনো পুরোপুরি শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেনি।[২৯] বাংলাদেশের সর্বস্তরে প্রত্যাশিত মাত্রায় বাংলা প্রচলনের অন্তরায় হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কারণে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক মনস্তত্ত্বে জেঁকে বসা হীনম্মন্যতাবোধ। এর প্রভাবে একদিকে 'উন্নত' ভাষা সংস্কৃত ও ইংরেজির অনুকরণে 'অনুন্নত' বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ করে নেওয়ার এক গভীর-ব্যাপক প্রক্রিয়া চলতে থাকে; অন্যদিকে 'মার্জিত' হয়ে ওঠার পরেও উচ্চশিক্ষা ও অফিস-আদালতের মতো 'উঁচু' জায়গাগুলোতে ইংরেজিকে বাংলা স্থানচ্যুত করতে পারে না।[৩০]

বাংলাদেশ থেকে ইংরেজ চলে গেছে কিন্তু ইংরেজি যায়নি। ব্রিটিশ রাজত্বের মতো ইংরেজি এখন আর সরকারি ভাষা নয় এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজির যে মর্যাদা ছিল, ইংরেজ বিদায় হবার পর সে মর্যাদা আর থাকবে না – এ সম্ভাবনা সবাই আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা প্রবর্তনের পরও ইংরেজি সহসা বিদায় হয়নি, সহকারি বা সহযোগী ভাষা হিসেবে ইংরেজি টিকে আছে।[৩১] ফলে ভাষা–আন্দোলনের মতো বিরাট ও মহৎ অর্জন সত্ত্বেও

আজ বাঙালির ভাষাজ্ঞান ও ভাষা-পরিস্থিতি এক করুণ পরিণতির দিকে এগিয়েছে।[৩২] মূলত বাংলাদেশের ভাষা রাজনীতিতে ইংরেজি হচ্ছে 'ক্ষমতার ভাষা' ও 'মূল্যবান পণ্য'।[৩৩]

৫. উপসংহার

বাংলাদেশ ২০২১ সালে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি বা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে । যে চেতনায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম তার মূলে প্রোথিত আছে ভাষা প্রশ্ন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনই মূলত বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে মূর্ত করেছে। ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশে বাংলা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং সংযোগের প্রধান মাধ্যম। বাংলাদেশের সরকারি কাজে প্রধানত বাংলা ব্যবহৃত হলেও বিদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগে, বিদেশি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জালিক সংযোগ রক্ষায় এবং উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত ইংরেজি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের ভাষানীতির মূল সূত্র বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ, যথা: "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।" কিন্তু উল্লিখিত সূত্রের উপরে ভিত্তি করে বাংলাদেশের কোনো সরকার এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো ভাষানীতি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চাশ বছর সময় পার হয়ে গেলেও রাষ্ট্রে ও সমাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার সার্বজনিক হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাষা বা বিদেশি ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে জটিলতা তৈরি হয়েছে। বাংলদেশের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে ভাষা-পরিস্থিতির উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গঠনে একটি ভাষানীতি করা প্রয়োজন। সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা উল্লেখ করে মূল কাজটি করা হয়ে গেছে। সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে ভাষানীতি প্রণয়ন করা ও একটি ভাষা-কমিশন গঠন করা উচিত এবং একভাষিতার নীতিকে সমর্থন না করে বহুভাষিকতা ও বিচিত্রতাকে প্রাধান্য দিয়ে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। একটি সুচিন্তিত ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা প্রণীত ও বাস্তবায়িত হলে সরকার ভাষা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে এবং তা বাস্তবায়নের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে ।

তথ্যসূচি:

---

১ Rahela Banu and Roland D Sussex, "English in Bangladesh after Independence: Dynamics of Policy and Practice", *Who's Centric Now? The Present State of Post-Colonial Englishes,* ed. B. Moore (Victoria: Oxford University Press, 2001), P. 122-147.

২ সাখাওয়াৎ আনসারী, "ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা: প্রসঙ্গ দাপ্তরিক ভাষা", *বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা*, স্বরোচিষ সরকার সম্পা. (রাজশাহী: আইবিএস, ২০১৫), পৃ. ৬১

৩ হুমায়ুন আজাদ, *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* (আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ২

৪ মনসুর মুসা, *ভাষা-পরিকল্পনার সমাজভাষাতত্ত্ব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৪

৫ মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ* (কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯), পৃ. ২৬৭

৬ রামেশ্বর শ', *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪), পৃ. ৫৯-৬১

৭ Edward Sapir, ''The Function of an International Auxiliary Language", *International*

Communication: A Symposium on the Language Problem, Herbert N. Shenton, Edward Sapir, and Otto Jespersen (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1931), P. 65-94.

[৮] মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ* (কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯), পৃ. ২৬৭

[৯] M. McGroarty, "Language Policy in the USA", *Language Policy*, ed. W. Eggington and H. Wren (Amsterdam: Benjamins, 1997), P. 1-29.

[১০] হানা রুথ টমসন, *বাংলা ভাষার বর্ণনা: একটি বিকল্প ব্যাকরণ*, স্বরোচিষ সরকার অনূ. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২১), পৃ. ৪২

[১১] মনজুরে মওলা, 'প্রসঙ্গ-কথা', *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*, শামসুজ্জামান খান, আজহার ইসলাম ও সেলিনা হোসেন, সম্পা. (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. পাঁচ

[১২] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খন্ড (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৭০), পৃ. ১৯

[১৩] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, *আমাদের ভাষা সমস্যা* (ঢাকা: রেনেসাঁস পাবলিকেশনস, ১৯৪৭), পৃ. ৩৩

[১৪] স্বরোচিষ সরকার, "মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষাপরিকল্পনা", *বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা: প্রত্যাশা ও অন্তরায়* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০২০), ২৮-৩৯। প্রবন্ধটি ২৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলা একাডেমি আয়োজিত মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে একক-বক্তৃতা হিসেবে পঠিত।

[১৫] তদেব, পৃ. ৩৯

[১৬] Mohammad Moniruzzaman, *Language Planning in Bangladesh*, Language Planning Newsletter, vol. 5, no. 3 (August 1979): P. 1-3.

[১৭] স্বরোচিষ সরকার, 'ভূমিকা', *বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা* (রাজশাহী: আইবিএস, ২০১৫), পৃ. আট

[১৮] হুমায়ুন আজাদ সম্পা., *বাঙলা ভাষা*, প্রথম খন্ড (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৪), পৃ. ১৯

[১৯] সুখময় সেনগুপ্ত, "প্রসঙ্গ-কথা", *বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা ১৮৩৫-১৯০৬* (কলকাতা: নাথ ব্রাদার্স, ১৯৬০), পৃ. iii

[২০] রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০৬), পৃ. ৩১৬

[২১] মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ভাষা প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও জিন্নাহ*, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

[২২] উদ্ধৃত, শামসুজ্জামান খান, "বাংলা প্রচলন প্রসঙ্গে", *দৈনিক বাংলার বাণী*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

[২৩] উদ্ধৃত, সাখাওয়াৎ আনসারী, "ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা: প্রসঙ্গ দাপ্তরিক ভাষা", *বাংলাদেশের ভাষানীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা*, স্বরোচিষ সরকার, সম্পা. (রাজশাহী: আইবিএস, ২০১৫), পৃ. ৬৪

[২৪] আবদুল্লাহ আল-মুতী, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬), পৃ. ৩৯

[২৫] Niaz Zaman, "National Language Policy", *Bangladesh in the New Millennium*, ed. Abul Kalam (Dhaka: University Press Limited, 2004), P. 203.

[২৬] M. Obaidul Hamid and Elizabeth J Erling, "English-in-Education Policy and Planning in Bangladesh: A Critical Examination", *English Language Education Policy in Asia*, ed. Robert Kirkpatrick (Switzerland: Springer, 2016), P. 25-48.

[২৭] M. Obaidul Hamid, "The Linguistic Market for English in Bangladesh", *Current Issues in Language Planning*, vol. 17, no. 1 (2016): P. 36-55.

[২৮] দেবেশ রায়, *উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯০), পৃ. ৬-৭

[২৯] হুমায়ুন আজাদ, *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮), ১৫; মোহাম্মদ আজম, "বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন: ইংরেজ ও ইংরেজির প্রভাব", *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা-সাহিত্যপত্র*, ৪০ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, জুন ২০১৪।

[৩০] মোহাম্মদ আজম, *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা: আদর্শ, ২০১৪), পৃ. ১২

[৩১] জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০), পৃ. ২৫

[৩২] আনিসুজ্জামান, "বাংলাদেশের ভাষা-পরিস্থিতি", *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ২৮৭-৯৭

[৩৩] Fakrul Alam, "Prefatory Note", *Reading Literature in English and English Studies in Bangladesh: Postcolonial Perspectives* (Dhaka: Writers Ink, 2021), P. XV.